Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চম্পকনগরের উপকথা : প্রসঙ্গ সুরভাবনা

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kazi Tamanna Haque Sigma
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.12
Pages	২৭৩-২৮৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

চম্পকনগরের উপকথা : প্রসঙ্গ সুরভাবনা

কাজী তামান্না হক সিগমা*

সারসংক্ষেপ : মধ্যযুগের একটি জনপ্রিয় আখ্যানকাব্য *মনসামঙ্গল*। প্রতিযুগে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানুষ এ-কাব্যকীর্তন শ্রবণ করে নিজেদের রসপিপাসা ও ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করেছে। জনপ্রিয় এ-কাব্য নিয়ে নবতর নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ। এ-বিভাগের প্রযোজনায় *মনসামঙ্গলের* রূপান্তরিত নাট্যরূপ *চম্পকনগরের উপকথার* সুরভাবনা নিয়ে পরিকল্পিত হয়েছে এ-প্রবন্ধ।

চির-বৈরী চাঁদ-মনসার আখ্যানকাব্য– *মনসামঙ্গলের* 'মনসা' সেই মধ্যযুগ থেকে অদ্যাবধি কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জনপদের এক শ্রেণির হিন্দু এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে কতক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষের কাছেও প্রবল 'শক্তি'র প্রতীকরূপে অথবা 'লৌকিক শাক্তধর্মে'র (আশুতোষ, ১৯৯৮ : ২৪৬-২৪৯) সর্বজনীন প্রতিনিধিরূপে মন্দির, হাটখোলা, গৃহস্থের বাড়ি সর্বত্রই পূজিত হয়ে আসছে। ব্যাপক জনপ্রিয় এই আখ্যানকাব্য– *মনসামঙ্গল* এর দুই প্রধান প্রতিপক্ষ চাঁদ আর মনসার দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পরফরম্যান্স স্টডিজ বিভাগের প্রযোজনা *চম্পকনগরের উপকথা* সৃজিত হয়েছে। আর এই প্রযোজনার আলোকেই "*চম্পকনগরের উপকথা* : প্রসঙ্গ সুরভাবনা" শীর্ষক আলোচনার সূত্রপাত। মনসামঙ্গল মধ্যযুগের একটি জনপ্রিয় 'লোকপুরাণ মঙ্গলকাব্য' তবুও এটি এর অন্তর্নিহিত শক্তি-ভয়, ভাব ও ভক্তিরস দ্বারা স্নাত হয়েও কীভাবে সমকালীন 'নাগরিক' চেতনায় বস্তুগত চিন্তা, যুক্তি আর বিশ্লেষণের নাট্য-আখ্যান হয়ে উঠতে পারে, কার্যত *চম্পকনগরের উপকথা* শীর্ষক বিনির্মিত নাটলিপিটির মাধ্যমে তা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। আর এই নিরীক্ষা সম্পাদনে অর্থাৎ নাটলিপির বিন্যাস প্রক্রিয়ায় চরিত্রের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের প্রকাশে এবং ঘটনার অগ্রসরমানতায় যুক্তি ও ভাবের প্রদর্শনে দেশজ ইতিবৃত্তের গঠন কাঠামো অনুসরণ করে, দেশজ নাট্যের অভিনয় উপাদান

*প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নৃত্য, গীত, গদ্য ও কাব্য প্রয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে কিভাবে 'নাটলিপি'র অর্ন্তগত ক্রিয়া সম্পাদনে গীতে আরোপিত সুর অপরিহার্য উপাদান হয়ে ওঠে, এই বিষয়টি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হবে।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টারের (২০১৫) পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বাংলাদেশের দেশজ নাট্যকলার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অনুশীলনের 'বিষয়' হিসেবে 'চম্পকনগরের উপকথা' নাটলিপিটি বির্নির্মাণ করা হয়। আবহমান কালজুড়েই এই বাংলার নাট্যকলা নৃত্য, গীত, কথা ও বাদ্যের 'অদ্বৈত' (সেলিম, ১৯৯৬ : ৩) বন্ধনে বহু ও বিচিত্র রীতি ও আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যে পরিবেশিত হয়ে আসছে। তাছাড়া 'চম্পক নগর' থেকে 'কারবালা', 'অযোধ্যা' থেকে 'কুরুক্ষেত্র' অথবা গাজী পীরের সুন্দরবন থেকে বিরহী মহুয়ার হাওর-গহীনে ছড়িয়ে থাকা কতশত আখ্যান-কাব্য কত কী উপায়ে সাধারণ দর্শক/ভক্ত/বিশ্বাসীর মানবিক, মানসিক এবং বিনোদনের চাহিদা পূরণের উৎস হয়ে ওঠেছে, সেই সকল প্রায়োগিক সূত্র ও সৌন্দর্য ভাবনা অনুসন্ধান করাই কার্যত এই সেমিস্টারের পাঠ্যসূচির মূল লক্ষ্য।

মনসার আখ্যান-কাব্য থেকে 'চম্পকনগরের উপকথা' নির্মাণের ক্ষেত্রে *মনসামঙ্গল* অন্তর্গত পালার (দৃশ্যের) বাছাই ও বিন্যাস প্রক্রিয়ায় বাংলার দেশজ নাট্যকলার প্রচলিত নাটলিপির রচনারীতি, পরিবেশনারীতি, অভিনয় উপাদান প্রভৃতি বিষয়গুলোকে মুখ্য বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়। তবে 'চম্পকনগরের উপকথা'– নাটলিপিটির নির্মাণ ভাবনায় দেবী মনসার উদ্দেশ্যে মাহাত্ম্যকীর্তন রচনার পরিবর্তে সমকালীন বিশ্ব ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে 'ক্ষমতা'র নির্মমতাকে নাট্য-ক্রিয়ার অন্তঃস্রোত হিসেবে গ্রহণ করা হলেও নাট্যের প্রায়োগিক ভাষা নির্মাণে দেশজ নাট্যকলার অভিনয় উপাদান– নৃত্য, গীত, বাদ্য, কাব্যময় বর্ণনা আর সংলাপকে গ্রহণ করা হয়েছে এর অঙ্গাভরণ হিসেবে। আর এই কর্মটি সম্পাদনে কৌশল হিসেবে দেশজ নাটলিপির অন্তর্গত কাঠামো– 'নমনীয় ও সহজে রূপান্তরযোগ্য' (সাইদুর, ২০১০ : ২০৮) অর্থাৎ 'নমনীয়তার ধারণা'র প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। নমনীয়তার ধারণা বলতে এক্ষেত্রে দেশজ নাটলিপির রচনা-রীতি এবং এর গঠন-কাঠামো সংশ্লিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতার কথা বলা হচ্ছে। সাধারণত দেশজ আখ্যান রচিত হয় অন্তমিল ছন্দ (পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী ইত্যাদি) বা কাব্যের বন্ধনে এবং এর গঠন-কাঠামোটি 'পালা'য় বিভক্ত থাকে। যেমন– 'মনসামঙ্গল' ত্রিশদিনে ত্রিশ পালায় বিভক্ত।' (আশুতোষ, ১৯৯৮ : ১৫) পদ বা পয়ারের অন্ত্যমিল ছন্দে বন্ধনের কারণে নাট্য-আখ্যানের *আধিকারিক* অথবা *প্রাসঙ্গিক* বিষয়যুক্ত একাধিক ঘটনার সংযোজন, বিয়োজন অথবা সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এইরূপ রচনারীতি ও গঠন-কাঠামোর কারণে একটি দেশজ আখ্যান সহজেই 'সুনির্দিষ্ট ও স্থির (Fixed text)

নাটলিপি'র বিপরীতে সরল, নমনীয় এবং রূপান্তরযোগ্য একটি নাট্য-কাঠামোয় গ্রহণসাপেক্ষে আখ্যানের সংক্ষিপ্তকরণ, সম্প্রসারিতকরণ অথবা পুনর্বিন্যাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। দেশজ পরিবেশনাসমূহের ঘটনা সম্প্রসারণ, সংক্ষিপ্তকরণ, রূপান্তর অথবা পুনর্বিন্যাস সবকিছুই দলের ইচ্ছা, অভিরুচি, গায়েনের সক্ষমতা, বায়নাসূত্রে নির্ধারিত সময়সীমার উপর নির্ভর করে। যেমন – দ্বি প্রহর, চার প্রহর, আট প্রহর। কার্যত দেশজ নাট্যকলায় নাটলিপির রচনা এবং পরিবেশনার এই সাধারণ নমনীয়তার ধারণাকে বিবেচনায় নিয়ে *মনসামঙ্গল* থেকে দৃশ্যের বাছাই ও বিন্যাস প্রক্রিয়া সম্পাদন এবং আখ্যানের নতুন ব্যাখ্যামূলক দৃশ্য সংযোজনার মাধ্যমে 'চম্পকনগরের উপকথা'র নাটলিপি সৃজিত হয়।

'চম্পকনগরের উপকথা' নাটলিপি রচনার জন্য উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয় *মনসামঙ্গলের* প্রসিদ্ধ তিন কবি বিজয়গুপ্ত, শ্রী রায় বিনোদ এবং বাইশ কবির প্রণীত *পদ্মাপুরাণ*। নব-নির্মিত এই নাটলিপি মনসার জন্মপালা থেকে শুরু করে লক্ষীন্দরের মৃত্যুপালা পর্যন্ত মোট ২৬টি নির্বাচিত ঘটনাংশের সমন্বয়ে সর্বমোট ২১টি দৃশ্যে দৃশ্যযোগে রচনা করা হয়। দৃশ্যগুলো হলো মনসা ও শিব, সনেকার পূজা, ঘট ভাঙা, মনসা ও নেতার বাগানবাড়ি ধ্বংসের পরিকল্পনা, বাগানবাড়ি ধ্বংস, বাগানবাড়ি জীয়ন, মহাজ্ঞান হরণ, সনেকা ও ছয়পুত্র বধ, সনেকার বিলাপ, সনেকার পুত্রবর লাভ, স্বর্গে ঊষা ও অনিরুদ্ধের নৃত্য, শিবের কাছ থেকে মনসার পুত্রবর প্রাপ্তি, চান্দের বাণিজ্যে গমন, মনসা ও নেতার পরামর্শে পুনরায় চান্দের দিব্যচক্ষু লাভ, লক্ষিন্দরের বিয়ের সিদ্ধান্ত, বেহুলার পরিচয়, মনসা ও নেতার বাসর ঘর ছিদ্রের পরিকল্পনা, বাসর ঘর তৈরি, লক্ষিন্দর ও বেহুলার বিয়ে, কালিনাগের দ্বিধা ও লক্ষিন্দরকে দংশন এবং বেহুলার বিলাপ।

সুরভাবনা

বলা হয়ে থাকে সংগীতের ভিত্তিভূমিতেই বঙ্গীয় সংস্কৃতি তার সরস শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আছে। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর (১৩৭৩-১৩৭৪) ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত। বাংলা 'লোকসংগীতে'র এই কোষ গ্রন্থে অসংখ্য সংগীতের মধ্যে অষ্টকগান, গাজীর গান, ঝাঁপান গান, ধর্মপূজার গান, ধুয়া গান, ঝুমুরগান, পাঁচালী, ভাসান গান, যাত্রা গান, রামায়ণ গান, গম্ভীরা নাচ, বনবিবির গান সহ আরো অনেক নাট্যমূলক আখ্যানধর্মী সংগীতের উল্লেখ রয়েছে। মহাকাব্য, পুরাণ, স্থানীয় অনার্য দেব-দেবী, পীর-দরবেশ, কিংবদন্তির বীর চরিত্রের মাহাত্ম্যকীর্তনার্থে এসকল গীত-আখ্যানে অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের ভাব ও রসাশ্রিত গীতল উপস্থিতি; সুরের বিশেষ ব্যবহারে আখ্যানের একাধিক অংশে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট উৎকণ্ঠাময় পরিস্থিতির মাধ্যমে তীব্র ভাবারোহীবেগ সৃষ্টি করা অথবা আখ্যানোক্ত চরিত্রের দ্বন্দ্বময় উপস্থিতি ও সংঘাতপূর্ণ গতিময়তা সৃষ্টির কারণে এই সকল পরিবেশনা নিছকই 'গীত'

নয় বরং নাট্যের জটিল 'ক্রিয়া'রও আধার হয়ে ওঠে। বলা যায়, এই গীত হচ্ছে লোক-আখ্যান দেহের জীয়নকাঠি। মনসার পরিকল্পনায় মায়ের হাতে বিষমাখা ভাত খাওয়ার পর ছয়পুত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে সনেকার মনে যে নিদারুণ বেদনার বান ভাসে তার প্রকাশ ঘটে নিম্নোক্ত সংলাপাত্মক গীতের মাধ্যমে –

নিজের হাতে বিষমাখা ভাত খাওয়াইয়া মরণকুপে দিলাম আমি ফেলাইয়া
বাবা ধন .... ও ....
যাদু আমার মানিক আমার বুকে ফিরি ফিরি আয় আয় আয় আয় আয় আয় রে
আমি কেমন করে সহিব এই জ্বালা
যাদু আমার মানিক আমার বুকে ফিরি ফিরি আয় আয় আয় আয় আয় আয় রে
বিহানে কে মাও কয়ে ডাকিবে, আঁচলেতে ভেজা মুখ মুছিবে
কই গেলি......ই.......
বাসিভাতে মিঠা দধি সাধি সাধি আর কারে আমি খাওয়াইব।

এখানে গীত কেবলই শব্দের ছন্দোময় বাঁধুনি নয় বরং সনেকার শোকসন্তপ্ত মনের গহীনে ঘনায়মান অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক আবেগের নাট্যিক প্রকাশ। 'গীত' ধারণায় তাই বহুমাত্রিক অর্থ, গুণ আর প্রয়োগ ব্যঞ্জনা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। বাংলার 'গীত' একদিকে যেমন শাশ্বত মানবিক আবেদনের অথবা সামাজিক মূল্যবোধের বর্ণনাত্মক ভাষা হয়ে উঠেছে, অপরদিকে তা উক্তি-প্রত্যুক্তি, কথোপকথন অথবা সংলাপেরও বাহন হয়ে আখ্যান বর্ণনা করেছে। আবার এই 'গীত' কুশীলবের দেহছন্দের বা নৃত্যের প্রধানতম বাহন হয়ে গ্রামীণ 'আসর'কে করেছে প্রাণবন্ত। এক কথায় বলা যায়, বাংলার 'গীত' কদাচই তার দেহ থেকে 'নৃত্য' ও 'নাট্য'কে বিচ্ছিন্ন করেছে। যেমন – মধ্যযুগের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা, কৃষ্ণ আর গোপীদের জটিল সম্পর্কের বহু ও বিচিত্র সংলাপাত্মক বা বর্ণনাত্মক অভিব্যক্তির প্রকাশে 'গীত'-ই যেন অনবদ্য নাট্য-উপাদান হয়ে *রাসনৃত্য, কীর্তন* অথবা *পদাবলি কীর্তনের* শত-সহস্র প্রহর ভক্তদের ধর্মীয় ও মানবিক চেতনায় রসদ জুগিয়ে চলেছে। অথবা, জনপ্রিয় আখ্যান-কাব্য *মনসামঙ্গলের* দেবী মনসার উদ্দেশে নিবেদিত *বেইল্লার নাচারী* অথবা *পদ্মার নাচনের* 'নৃত্য' যেন 'গীতে'রই আরেক রূপ ধরে মনসা ও চাঁদ সওদাগরের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের নাট্য-ভাষা হয়ে উঠেছে। আবার মুসলিম বীর ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন, হানিফা, আমির হামজা প্রভৃতি মুসলিম বীরদের উদ্দেশে নিবেদিত *নাইচের জারীতে* দেখা যায় 'নৃত্য' সর্বদাই যেন এক শৈল্পিক কাঠামোয় ক্রিয়াশীল। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই সকল পরিবেশনায় 'নৃত্য' যদি হয় আসর-নির্মিত আখ্যান-শিল্পের 'শরীর', তবে ভাব, রস ও কাব্যের সংশ্লেষে 'গীত' (সংলাপাত্মক অথবা বর্ণনাত্মক) হচ্ছে এর প্রাণ। ফলে 'গীত'কে সর্বাংশেই দেখা যেতে পারে এক দেহে বহুর আশ্রয়ে অভেদাত্মক পরিবশেনা রূপে– "A Performance can be composed of (1) dance

(2) instrumental music and (3) speech rendered in prose, verse or lyric, either in the form of narration or that of dialogue". (Syed Jamil, 2000 : 18)

তবে গীতের বহুমাত্রিক সম্ভাবনা নিরীক্ষার ব্যাপারটি 'ছন্দের' গঠন-কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেননা ছন্দের গঠন-কাঠামোর একাধিক শর্তপূরণের মাধ্যমেই কার্যত আখ্যান নির্দেশিত বিষয়ের ভাব, রস এবং চরিত্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের গীতল অথবা কাব্যময় অভিব্যক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। আর এই শর্তপূরণের ক্ষেত্রে *মঙ্গলকাব্য* নির্দেশিত 'ছন্দ' বৈচিত্র্যকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মৌখিক ও প্রচলিত গীতময় কাহিনি থেকে মঙ্গলকাব্য রচিত হলেও 'লৌকিক ছন্দ' বা 'ছড়ার ছন্দের' তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লক্ষ করা যায় না বরং মঙ্গলকাব্যে অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় বলে আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে অভিমত দিয়েছেন "...অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দে পদ রচনা করিতে গিয়াও তাহাতে অনেক সময় অক্ষরের মাত্রা কম বেশী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা গানের প্রয়োজনে রচিত হইত বলিয়া অক্ষর বা কোন মাত্রার অভাব গানের সুরের মধ্য দিয়া পূরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে।" (আশুতোষ, ১৯৮৯ : ২০) এর ফলে অন্তমিল ছন্দের মধ্য থেকে স্বর ও সুরের সমন্বয়ে স্বরযুক্ত ছন্দ অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ছন্দের উদ্ভব ঘটে। গবেষকদের মতে, 'মঙ্গলকাব্য লিখিত হওয়ার যুগেই পয়ার ছন্দ জন্মলাভ করেছে। যতদিন মুখে মুখে এই কাহিনি প্রচলিত ছিল, লিখিত রচনা আত্মপ্রকাশ করেনি; ততদিন অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দের জন্ম হয়নি, তখন সাধারণত মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দেরই প্রচলন ছিল। আবার অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দকে পাঁচালী ছন্দও বলা হতো। ফলে মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রধানত দু রকম ছন্দ পাওয়া যায়– দ্বিপদী বা লঘু পয়ার ছন্দ এবং ত্রিপদী ছন্দ।

এছাড়াও, মধ্যযুগে রচিত গীত আখ্যানের গতি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে এবং একাধিক কুশীলবের অংশগ্রহণে ভাব-রসের তীব্রতা নিশ্চিত করতে 'ধুয়া' বা 'ধ্রুবপদে'র পুনঃপুনঃ ব্যবহারও বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে: 'সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক গীতির বৈচিত্র্যহীন সুরের একঘেয়েমি দোষ দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দোহার কর্তৃক ধুয়া ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকে ঘোষাও বলে, শুদ্ধ ভাষায় তাহা ধ্রুবপদ বলিয়া পরিচিত।' (আশুতোষ, ১৯৮৯ : ২৫)

যেহেতু মধ্যযুগের গীত-আখ্যান *মনসামঙ্গলের* বিষয়বস্তু নিয়ে 'চম্পকনগরের উপকথা' রচিত, স্বাভাবিকভাবেই 'গীত' এই নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে গীত ও সুর প্রয়োগের ভাবনায় *মনসামঙ্গল* বা *পদ্মাপুরাণের* পরিবেশনায় প্রচলিত গীত ও সুর প্রাধান্য পেলেও নতুন সুরের সৃজন এবং মৌলিক সুরের নিরীক্ষার বিষয়টিও সমভাবে প্রাধান্য লাভ করে। বস্তুত নাটলিপির ঘটনাক্রম

অনুসারে 'নাট্যিক মুহূর্ত' সৃজনকল্পে, চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে অথবা ঘটনার ভাবারোহী বেগ নির্মাণের লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি 'দর্শকে'র শ্রেণি-বৈচিত্র্য বিবেচনায় রেখে নাট্য-ক্রিয়ার ভাব-রস ও বিষয়ভেদে সুরের বৈচিত্র্য-ভাবনাকে প্রাধ্যান্য দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে 'চম্পকনগরের উপকথা'র সামগ্রিক পরিবেশনার 'সুর বিন্যাসে' তিনটি নীতি অবলম্বন করা হয়।

ক. মূলানুগত সুরঃ প্রচলিত লোক সুরের উৎস বা মূলের প্রতি অনুগত থেকে গীতের ব্যবহার। অর্থাৎ লোকায়তনে পরিবেশিত পদ্মাপুরাণ এবং প্রচলিত অন্যান্য মৌলিক সুরের সাথে রচিত আখ্যানের ছন্দোবদ্ধ 'পদ' বা 'পয়ার ছন্দে'র ব্যবহার।

খ. নিরীক্ষাধর্মী সুর : প্রচলিত লোক বা ঐতিহ্যবাহী সুরের গঠন-কাঠামো (সুর+ছন্দ+তাল) ও বিন্যাসের (কম্পোজিশান) সাথে উদ্ভাবনী সুর-ভাবনা ও বিন্যাসের সমন্বয়।

গ. উদ্ভাবিত সুর : লোকজ সংগীতের ভাব-রস, গঠন-কাঠামো, বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে সুরের সৃজন বা 'উদ্ভাবিত' সুরের ব্যবহার।

এই তিনটি ধারায় বিন্যস্ত গীত ও সুরের প্রয়োগসূত্রেই বস্তুত 'চম্পকনগরের উপকথা'র আখ্যান অন্তর্গত একাধিক নাট্যিক মুহূর্তের সৃজন, বিষয়ের ভাবারোহী বেগ নির্মাণ এবং চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় তথা সমগ্র আখ্যানের গীতযুক্ত ক্রিয়ার উপস্থাপন ও বিন্যাস নিশ্চিত করা হয়।

ক. মূলানুগত সুর :

এই ধারার সুরের মাধ্যমে চারটি গীত সৃজন করা হয়। একাধিক লোকনাট্য পরিবেশনায় প্রচলিত সুরের গঠন-কাঠামো, সুরের মূল ভাব ও রস অক্ষুণ্ন রেখে আখ্যান রচিত পদ বা পয়ার সমন্বিত করে এই গীত সৃজন করা হয়। তবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নাট্যিক ক্রিয়া এবং তার ভাব ও বিষয় বিবেচনায় গীতের গতি বা লয়-বৈচিত্র্য সৃজনকল্পে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়। এই ধারার সুরের মাধ্যমে নিম্নোক্ত তিনটি গীত সৃজন করা হয়েছে।

১. মহাজ্ঞান হরণ: মনসা বেশ পরিবর্তন করে, ছল করে মালিনী রূপে চান্দ সওদাগরের কাছ থেকে মহাজ্ঞান হরণের ক্রিয়া প্রদর্শনে এই গীত প্রয়োগ করা হয়। পদ্মাপুরাণে 'মহাজ্ঞান হরণ' পালা পর্বের মহাজ্ঞান হরণ বিষয়টি সাধারণত গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই রীতি বিবেচনায় *চম্পকনগরের উপকথার* এই অংশটির ক্রিয়ার বিন্যাস গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। যেখানে চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ প্রয়োগের কারণে দৃশ্যটি কার্যত সংলাপাত্মক গীতাভিনয়ের রূপ লাভ করে। গীতটির বিন্যাস

১ম পুরুষে সংলাপাত্মক অভিনয়ে করা হলেও কোরাস বা দোহার দল তৃতীয় পুরুষে বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়যোগে ক্রিয়ার ভাবারোহী বেগ তীব্র করে তোলে। যেহেতু মহাজ্ঞান হরণ বিষয়টিকে একটি সুরে পরিবেশন করা হয়েছে, তাই মূল ক্রিয়াটিকে গৃহীত সুরের বৈশিষ্ট্য অনুসারে রচনা ও বিন্যাস করা হয়। মনসা ছলনা করে চান্দের মহাজ্ঞান হরণ করে; তাই এখানে নাট্যক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চটুল সুরের ব্যবহার করা হয়, যা ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশে কার্যকর হয়ে ওঠে। গৃহীত মূল সুরে ৮ মাত্রার কাহারবা তাল রক্ষা করা হলেও একদিকে মনসার ছল করা ও ছলনায় বশীভূত করা, অপরদিকে চান্দের নারী লোলুপতার প্রকাশ ও ছলনায় বশীভূত হওয়া– এই দুই ভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার প্রকাশে তাল ও লয়ের বিন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয় এবং তাল-যন্ত্রের বাদন-বৈচিত্র্যেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়। তাছাড়াও গীতটির সামগ্রিক বিন্যাসে একঘেয়েমি দূর করতে ক্রিয়ার কিছু কিছু অংশে সংলাপাত্মক বাক্য ব্যবহার করা হয়। সর্বোপরি মহাজ্ঞান হরণ ক্রিয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এমন একটি সুর বিবেচনা করা হয়, যে সুরের মধ্যেই রয়েছে সেই শক্তি, যেখানে মনসার রূপে মুগ্ধ হয়ে চান্দের বোকা বনে যাওয়া এবং সর্বস্ব (জ্ঞান) বিকিয়ে দেওয়া সহজেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়।

'গুজরাসতীর বনবাস' – এই পরিবেশনার একটি চটুল ভাবরসাত্মক গীত–

সোনার কলসী কাঙ্খে পুকুর ঘাটে
জল ভরিতে যায়

উপরোক্ত গানের সুরে *চম্পকনগরের উপকথা* নাটকের মহাজ্ঞান হরণ গীতটি বিন্যাস করা হয় এই ভাবে-

বলি ও সুন্দরী কে গো তুমি
রূপে অপরূপা

২. কালিনাগের বিলাপ : 'গুজরাসতীর বনবাস' পরিবেশনায় একটি করুণ রসের গান –

আমি কেমনে বিদায় দেব গো ... ও ... প্রাণ স্বামী –

গানটির সুরে *চম্পকনগরের উপকথার* গানটি হল –

আমি কেমনে দংশিব গো ... ও ... সোনার লক্ষাইরে"

দ্রুত কাহারবা ছন্দে বিলাপের ঢংয়ে এই গীতটির ব্যবহার করা হয়েছে কাল-নাগিনী চরিত্রের দ্বারা। গীতটির বিলাপ ও আহাজারি শক্তি কাহিনির লক্ষিন্দর-দংশন ক্রিয়ার বিশেষ মুহূর্তকে আরও ঘনীভূত করে। ভাবাবেগে সিক্ত হতে সুরের যে ভূমিকা থাকে তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে এই গীত। দংশন-ক্রিয়া প্রদর্শনে কাল-নাগিনীর মনের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিবেকের তাড়না সর্বোপরি দংশনের যুক্তি নির্মিত হয়, তাকে যথাযথ ও পূর্ণরূপে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই গীত গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে

কাজ করে। তবে গীতটির বিন্যাসে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর তালের ব্যবহার। পয়ার থেকে ধুয়াতে প্রবেশ করার সময়ে একটি বিশেষ ঝোঁকের মাধ্যমে, মধ্য লয় হতে দ্রুত লয়ে পরিবেশন প্রক্রিয়াটিই এই গীতটির তাল ও লয় বিন্যাসে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তালের বিশেষ ঝোঁকগুলোর মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়-ছন্দে একধরনের দোলা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যার ফলে দর্শক খুব সহজেই পরিবেশনাকারীর দংশন-ক্রিয়ার ভাবের সাথে যুক্ত হয়ে নাট্য-রস আস্বাদন করতে সক্ষম হয়।

৩. দক্ষিণ পাটন গমন : গাভির বাছুর হওয়ার পর একমাস পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে এক ধরনের কৃত্য পালনের প্রচলন রয়েছে (বহুল প্রচলিত নয়) নাটোরের কিছু কিছু অঞ্চলে। কীর্তন বা পাঁচালি আঙ্গিকের এই পরিবেশনা, যা গোরক্ষনাথের কীর্তন বা গোরক্ষনাথের পাঁচালি নামে পরিবেশিত হয়। এরকম একটি পরিবেশনা থেকে সুর গ্রহণ করে *চম্পকনগরের উপকথা* নাটকে চান্দের বাণিজ্যে গমন বা দক্ষিনপাটন গমন গীতটি বিন্যাস করা হয়।

গোরক্ষনাথের পাঁচালির এই গীতটি ছিল ৮ মাত্রায় বিন্যস্ত, যা পুঁথিপাঠ রীতির একটি বিশেষ সুর ও তালের একরৈখিক ব্যবহার :

জা	গে	রে	গো	ধে	নু	বা	ছুর	দি	য়ে	আ	ছেন	ব	র	হে	চ্চো
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ন	ঠ	রা	ত	ন	।	দি	ন	যু	গ	যু	গান্	ত	র	হে	চ্চো
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বা	রো	ব	ছ	রে	র	না	রী	তে	র	না	হি	পূ	জে	হে	চ্চো
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
হে	ন	কা	লে	গোয়া	লা	না	রী	গোর	খো	ধা	র	সু	জে	হে	চ্চো
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

উপরোক্ত গীতের সুর ও ছন্দের আদলে বিন্যস্ত দক্ষিণপাটন গমন ও মনসার নৌকা ডুবানোর গানটি নিম্নরূপ :

চান্দ	সওদা	গর	মজে	কর্মে	দিয়া	মন	।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
উানি	জ্যেতে	যাইবে	সে	দক্ষি	নপা	টন	হেইয়ো
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সনে	কায়	নিষেদ	করে	করে	যে	বারন	তবু
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
যাবে	ইযা	বেই	চান্দ	দক্ষি	নপা	টন	হেইয়ো
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
হেই	হেইয়ো	।	।	হেই	হেইয়ো	।	।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের এই গীতটির প্রথমাংশে বাণিজ্যে গমন-ক্রিয়া বর্ণিত হয় এবং দ্বিতীয়াংশে মনসা চান্দের তরী ডুবিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে পূজা দিতে বাধ্য করার ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। তবে দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ তরী ডুবানোর ক্রিয়া প্রদর্শন উপলক্ষ্যে গীত-সুরের স্কেল, তাল ও লয়ের পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ 'মুদারা' স্কেল থেকে 'উদারা'য় এবং কাহারবা তালকে তেওড়া তালে পরিবর্তন করে গাওয়া হয়।

ফলে কাহারবা তাল চলাকালীন গানের যে গতি ও চলমান যাত্রাকে প্রকাশ করছিল– সেখানে মনসার আগমনে যাত্রাপথে যে বাধা ও ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থাকে প্রকাশ করতে গানের তাল, লয় ও স্বরের পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দর্শক চিত্তে ভয়ানক রস আস্বাদন করানোই যার মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ফলে দর্শক মনসার হিংস্র রূপ ও চান্দের ভীতি রূপ নাট্যক্রিয়ার সাথে সহজে একীভূত হয়ে যেতে পারে।

খ. নিরীক্ষাধর্মী সুর

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগে অধ্যয়নকালে আমার সুযোগ হয়েছিল বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল আহমেদের পরিচালনায় *বেহুলার ভাসান* (২০১০) পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করার। এই পরিবেশনায় একই সাথে 'বেহুলা' ও 'গায়েন' চরিত্রে অভিনয় করার সূত্রে বেশকিছু বিষয় আমার অভিজ্ঞতাকে ঋদ্ধ করে – যেমন, নাট্যক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে সুর ও গীতের প্রয়োগ অন্যতম এবং একই সুর বিষয়, ভাব ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন রসানুভূতি সৃষ্টি করে।

এছাড়াও বিভাগের প্রযোজিত একাধিক লোকনাট্য পরিবেশনায় যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায় – সমপদী তালের যে আবেদন তা বিষমপদী তালের ক্ষেত্রে হয় ভিন্ন। নাট্যক্রিয়া সংগঠনে সংলাপাত্মক গদ্যের বিকল্প হিসেবে কিভাবে সুর, তাল ও ছন্দ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই সকল অভিজ্ঞতাই কার্যত চম্পকনগরের উপকথায় নিরীক্ষাধর্মী সুর ভাবনাকে আলোড়িত করে।

চম্পকনগরের উপকথায় নিরীক্ষাধর্মী সুরের ব্যবহার করা হয় দুটি নাট্যক্রিয়ায়। প্রথমটি 'বন্দনায়' এবং দ্বিতীয়টি 'অনিরুদ্ধ ও ঊষার নৃত্য' দৃশ্যে।

১. চম্পকনগরের উপকথা নাটকে বন্দনা গীতে সুরের ভিত্তিটি গ্রহণ করা হয় *কুশানগানের* বিষমপদী বা তেওড়া তালে বিন্যস্ত একটি গুরু ভক্তিমূলক গীত। বিষমপদী এই সুরের ওপর ভিত্তি করেই নিরীক্ষা হয় চম্পকনগরের উপকথা নাটকের বন্দনা।

কুশানগান পরিবেশনাটির বন্দনা গীতটি ছিল নিম্নরূপ –

গুরুর নাম লয়ে দাঁড়াইলাম আসরে

এসো হে, ও মোর দয়ালও গুরুজী

গুরুর	নাম	ল	ও	য়ে	।	দা	।	ড়াই	লা	ম	আ	।	স	।
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রে	।	।	।	।	।	।	।	।	।	এ	।	সো	।
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	হে	।	।	।	।	।	।	।	।	।	ও	।	মো	র
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	দ	।	।	য়া	।	লা	।	গু	রু	।	জী	।	গু	রুর
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১	২	৩	৪	৫	৬	৭

৭ মাত্রার এই গীতটিকে ৮ মাত্রার কাহারবা তালে পরিবেশনে নিরীক্ষা করা হয়। আর এ জন্য সুর ও তালে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিম্নোক্ত চম্পকনগরের উপকথা নাটকের বন্দনা গীত সৃজন করা হয়েছে।

নাম	ল	য়ে	দা	ড়াই	লাম	আ	স	রে	।	।	।	ঠ	।	দ	য়াল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
নাম	ল	য়ে	দা	ড়াই	লাম	আ	স	রে	।	।	।	ঠ	।	প্র	ভুর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
নাম	ল	য়ে	দা	ড়াই	লাম	আ	স	রে	।	।	।	ঠ	।	ও	দ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
য়া	।	।	।	।	।	।	প্র	ভু	।	।	দ	ছা	ম	য়	তোমার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

বন্দনাগীতটির 'পদ' বা 'পয়ার' বিভাগীয় পূর্ব প্রযোজনা *বেহুলার ভাসান* দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও এর সাথে নতুন 'পদ', পরিবর্তিত তাল এবং সুর সংযোজনের মাধ্যমে বন্দনা গীতটির নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়।

২. অনিরুদ্ধ ও ঊষার যে নৃত্য স্বর্গে পরিবেশন করা হয় সেই অংশটি 'ময়ূরভাঞ্জ ছৌ নাচ' (গায়ত্রী, ২০০৮ : ২২২)-এর আদলে তৈরি করা হয়। শৃঙ্গার রসের এই নৃত্য অংশকে নাটকের অন্যান্য অংশ থেকে বিশেষ ও আলাদা রূপে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এই নৃত্যের সময় তাল যন্ত্র পাখোয়াজে দাদরা ছন্দের ব্যবহারের সাথে বাঁশিতে শৃঙ্গার রসের সুরের ব্যবহারের পাশাপাশি ময়ূরভাঞ্জ ছৌ নাচের একটি বোল ব্যবহার করা হয়। ফলে স্বর্গীয় একটি আবহ তৈরি হয় যা মর্ত্য থেকে আলাদা রূপে পরিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও এই অংশে ধ্রুপদী আঙ্গিকের দেহ ভঙ্গির সাথে বাঁশির সুর, পাখোয়াজের ছন্দ ও মৌখিক বোলের ব্যবহার এই বিশেষ নৃত্য অংশকে একটি ভিন্ন আবহ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

গ. উদ্ভাবিত সুর

চম্পকনগরের উপকথা নাটকে– লোকজ গীতের গঠন-কাঠামো, ভাব-রস, সুর বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বেশ কয়েকটি সুরের উদ্ভাবন এবং নাট্যক্রিয়ায় সমন্বয় করা হয়। এই পর্যায়ে মোট চারটি গীত সৃজন করা হয়। প্রত্যেকটি সুরই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন ভিন্ন রসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই সুরগুলিতে।

১. সনেকার পূজার গান : নাটকের শুরুতে পরিবেশিত হয় সনেকা কর্তৃক মনসাকে পূজা দানের নাট্যক্রিয়া, যা বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ে উপস্থাপিত হয়। আমাদের দেশজ নাট্যে ভক্তি বা প্রার্থনাধর্মী নাট্যক্রিয়ায় কীর্তনের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পূজার দৃশ্যে কীর্তনধর্মী একটি সুর সৃজন করা হলেও গীতটি সম্পূর্ণত কীর্তন নয় বরং বলা যায় গীতটির সৃজনে রয়েছে কীর্তন-ভাব। এই গীতটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে দুই প্রকারের তালের ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু সনেকা সুন্দরী চাঁদ সওদাগরের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাড়িতে পূজার আয়োজন করে তাই এই গানে কীর্তন ঢং উপস্থিত থাকলেও তথাকথিত দাদরা তাল ব্যবহার না করে বিষমপদী বা 'তেওড়া' তাল দিয়ে গানটি শুরু হয়। আবার একই সাথে চান্দ সওদাগরকে না জানিয়ে লুকিয়ে পূজা, অর্চনা, বন্দনা করা হলেও সবার অন্তরের গহীনের বাঁধভাঙ্গা মধুর ভক্তিরস প্রকাশের জন্য গানের পরবর্তী অংশে ব্যবহৃত হয় 'দাদরা' তাল; যেই তালকে সহজেই লয় পরিবর্তন করে 'ঝুমুর' তালে রূপান্তর করা হয়। ঝুমুর তাল ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই মন, প্রাণ সর্বস্ব সঁপে দিয়ে বির্সজনের মাতমে উন্মত্ত হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ একটি মহা উৎসবের আবহ তৈরি করা হয় এই দাদরা-ঝুমুরের সমন্বিত তাল ব্যবহারের মাধ্যমে।

২. সনেকার বিলাপ : ছয়পুত্রের মৃত্যুতে চান্দের স্ত্রী সনেকার বিলাপ গীতটি নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছয়পুত্রের মৃত্যুর পর সনেকা ও ছয় বধূর যথাক্রমে পুত্র ও স্বামী হারানোর শোকের ভীষণ বেদনা-বিধুর এক নাট্যক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে এই বিলাপের মাধ্যমে। বলা যায় নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকটশীর্ষ বা জটিল নাট্য-মুহূর্ত এ অংশটি। এই নাট্যক্রিয়ায় সনেকা ও ছয়বধূর আহাজারি সূত্রে বিষাদের ভাবারোহীবেগ নির্মিত হয় এবং দর্শক চিত্তে করুণ রসের নিষ্পত্তি ঘটে। একই সুর ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে ব্যবহৃত হলে সুরের আবেদনও যে ভিন্ন হয় তার উদাহরণ রয়েছে এই গানে। গানটি যেভাবে শুরু হয় – সনেকা তার ছয় ছেলেকে নিয়ে দধিমাখা ভাত খাওয়াতে থাকে, যা মাতৃভক্তিতে মধুর রসের সঞ্চার ঘটায়, সেই একই গান ধীরে ধীরে করুণ রসে রূপান্তরিত হয় যখন সনেকা বুঝতে পারে তার নিজের হাতেই বিষমাখানো ভাত খেয়ে আদরের ছয় সন্তান মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। এই গানের সুরের মধ্যেই সেই শক্তি আছে যা দর্শককে করুণ রসের

দিকে নিয়ে যায়। গানের শুরু যেভাবে হয়, শেষ হয় ঠিক তার বিপরীত ভাবে। এই গানটি ধামাইল সুর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্ভাবনী সুরের সমন্বয়ে নব-আঙ্গিকে সৃজন করা হয়। নাট্যক্রিয়ার বিষয় ও ভাব বিবেচনায় গীতটির কোনো কোনো অংশে তালের দ্রুতগতির ব্যবহার করা হয়, আবার নির্দিষ্ট কিছু অংশে সংকটাপূর্ণ অবস্থার তীব্রতা প্রকাশে বাদ্যযন্ত্র পরিহার করে বিশেষ মুহূর্ত নির্মাণের চেষ্টা করা হয়। ফলে সুর, তাল, লয়ের বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের কারণে উদ্ভাবিত বিলাপধর্মী এই সুরটি দর্শকের আবেগকে আরও ঘনীভূত করে।

৩. বাসর ঘর তৈরি : *বিহার রাইতে কাটবে লখাইরে।* এই সন্তাপ, দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণের জন্য চান্দ যখন লোহার বাসর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল তখন লোহার বাসর নির্মাণ-ক্রিয়া প্রদর্শন করা হয় এই গীতটির মাধ্যমে– "বাসরের এক কোণে কামার ছিদ্দর রাখিল"।

গীতটির অঙ্গীরস ভয়ানক। সেই সাথে এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার চেষ্টায় বীররসেরও অবস্থান ছিল এই গানে। ভয় ও বীররসের মিশ্র প্রকাশ এই গানটি। তাই এই গানটি লোকজ সুরের আদলে তৈরি হলেও কোমল স্বরের ব্যবহার থাকায় ধ্রুপদী গানের আবহ রক্ষা করা হয় এই গানে। গীতটির স্বর ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'টোড়ী' ও 'পুরবী' রাগের বেশকিছু স্বরের প্রয়োগ করা হয়। 'পুরবী' ও 'টোড়ী' রাগে 'শুদ্ধ নিষাদ' ব্যবহৃত হলেও এই গানে 'কোমল নিষাদ' ব্যবহার করা হয়। এবং 'কোমল মধ্যম' স্বরের ব্যবহারের কারণে এই গীতটিকে মিশ্র টোড়ীও বলা যেতে পারে। এইরূপ মিশ্র স্বরের প্রয়োগের সমান্তরালে যুক্ত করা হয় আমাদের গ্রাম-বাংলার যুদ্ধ, লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বাঁশ, যা এইক্ষেত্রে একটি তালযন্ত্র হয়ে ওঠে। যেহেতু একটি ভাঙন আর গড়নের আভাস রয়েছে এই সুরে, তাই দৃশ্যগত প্রয়োজনে এই গানের তাল যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় বাঁশ, যা বাসরঘর নির্মাণ নাট্যক্রিয়ায় প্রদত্ত ভাঙন আর গড়ন উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়ে ওঠে।

–	ভয়ে	কা	মার	না	বু	ঝি	ছা	কি	ভু	ল	ক	ডর	ল	।	।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
–	পর্স	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	র্স	ণ	ণ	দণ	দপ	ঈ	প	প	প

।	বাস	রের	এক	কো	ণে	কা	এার	ছি	দ্র	র	রা	খি	ল	গো	ও
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প	ক্ষ	ক্ষ	ক্ষ	প	প	দ	ণ	দ	প	দ	প	ঈ	প	দপ	ক্ষ

রাগমিশ্রিত এই গীতাভিনয়ে কোমল ও শুদ্ধ স্বরের যুগ্ম ব্যবহার এবং তাল যন্ত্র হিসেবে বাঁশের ব্যবহারে এই গানটির সুর-বিন্যাস বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, একই সাথে সুর-ভাবনায় মৌলিকত্ব প্রকাশ পায়।

৪. বেহুলা ও লক্ষীন্দরের বিয়ার গীত : ছয়পুত্র নিধন পরবর্তী নাটকের এই পর্যায়ে অবতারণা করা হয় একটি বিয়ার গীত। বেহুলা এবং লক্ষীন্দরের বিবাহ দৃশ্যে পূর্ববর্তী করুণ ও ভয়ানক রসের বিপরীতে শৃঙ্গার ও হাস্যরস বিবেচনায় সৃজন করা হয় একটি চটুল সুর। গীতটির সুর, তাল ও লয়ের বিন্যাসে দুটি পক্ষ বেহুলার সখী পক্ষ এবং লক্ষীন্দরের সখা পক্ষকে প্রতিনিধিত্ব করে। এক পক্ষের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ৮ মাত্রার দ্রুত লয়ের কাহারবা তালের ব্যবহার এবং অপর পক্ষের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে মধ্য লয়ের কাহারবা, যেখানে পাহাড়ি মাদলের বাদন রীতিকে আশ্রয় করা হয়েছে। সুর, তাল এবং লয়ের বিন্যাসে এইরূপ বৈচিত্র্য নির্মাণের লক্ষ্য হচ্ছে বেহুলার সখী ও লক্ষীন্দরের বন্ধুদের রসিক ও চটুল বাকবিতণ্ডার কার্যকর প্রকাশ ঘটানো। এছাড়া এই গীতটির আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হাতের তালিতে তাল নির্মাণ করা, যা সহজেই উৎসব আবহ তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কাহারবা তালের এই গানটির প্রতিটি ৫,৬,৭ নং বিটে ৩টি করে তালির ব্যবহার করা হয়।

বি	য়ার	সা	জে	ন	য়া	লা	জে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				১	২	৩	
সুন	দরী	বেউ	ঔা	আই	লো	রে	।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				১	২	৩	
দে	খো	স	বে	দে	খো	রে	।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				১	২	৩	

(১,২,৩ দ্বারা তালির সংখ্যা বোঝাচ্ছে)

"বাঙলা নাটকের অজস্র আঙ্গিক সহস্র বৎসরের ধারায় বাহিত হয়েছে, কিন্তু আদ্যন্ত তার দেহমনে অদ্বৈতের ঝঙ্কার বিদ্যমান। নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ – তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বন পূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেই বাঙলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে" (সেলিম, ১৯৯৬ : ৩)।

চম্পকনগরের উপকথা নাটলিপির অর্ন্তগত ক্রিয়া সম্পাদনে 'সুর-ভাবনা' প্রসঙ্গ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এমন যে, মধ্যযুগের পুরাণ অনুসৃত একটি আখ্যান ও আখ্যান প্রদত্ত নাট্যক্রিয়ায় সুরের বহুমুখী ব্যবহার করা এবং অভিনয় উপাদান হিসেবে সুরের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। আর এ লক্ষ্যেই – ক. মূলে অনুগত সুরের ব্যবহার – যেখানে সুরের ছন্দ ও বিন্যাসে লোকজ সুরের নির্মল ভাব ও রসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। খ. নিরীক্ষাধর্মী সুরের ব্যবহার। এই ক্ষেত্রেও নাট্যক্রিয়ার রূপ, রস ও যুক্তি বিবেচনায় রেখে লোকজ সুরের সাথে নির্দেশকের সুর, তাল এবং লয়ে নিরীক্ষা-ভাবনার সমম্বয় করা হয়েছে। এবং গ. উদ্ভাবনী সুরের ব্যবহার – অর্থাৎ নাট্যক্রিয়ার স্বরূপ (যুক্তি এবং ভাবাবেগ) বিবেচনায় রেখে সুরের ছন্দ ও বিন্যাসে নির্দেশকের সৃজনী সুর-ভাবনার প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুত, এই তিনটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং সমকালীন শিল্পভাবনা আত্মস্থ করে নির্মিত হয়েছে *মনসামঙ্গলের* রূপান্তরিত নাট্যপ্রযোজনা *চম্পকনগরের উপকথা*।

গ্রন্থপঞ্জি

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৯৮)। *বাংলা মঙ্গকাব্যের ইতিহাস*, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় (২০০৮)। *ভারতের নৃত্যকলা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

সাইদুর রহমান লিপন (২০১০)। *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সেলিম আলদীন (১৯৯৬)। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Syed Jamil Ahmed (2000)। *Achinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh,* UPL, Dhaka